শোষণ মুক্তির অর্থনীতি

মোহাইমিন পাটোয়ারী

ঐতিহ্য

সূচি

চিন্তা ৭
ঋণ ৯
সুদ ১২
দান ১৫
সর্বজনীন সুরক্ষা ২০
কর ২৪
ব্যবসা ৩০
মুক্তবাজার অর্থনীতি ৩০
এন্টি ডাম্পিং, এন্টি ট্রাস্ট, স্পর্শকাতর শিল্প ও শিশু শিল্প ৪০
আইন ও বিচারব্যবস্থা ৪৬
উন্নয়ন ৫৪
রাষ্ট্রীয় ব্যয় ৬২
রাষ্ট্রীয় আয় ৭০
জুয়া ৭২
স্পেকুলেশন বা ফটকাবাজি ৭৮
বিমা ৮২
ব্যাংক-সম্পদ চুরির গোপন কৌশল ৮৪
মুদ্রাস্ফীতি ৯০
মুদ্রা ব্যবস্থা ৯৪
কেন আমাদের এই অর্থনৈতিক কাঠামো সমর্থন করা উচিত? ১০৩
আন্তর্জাতিক অঙ্গন ১০৫
সব মুদ্রা এক দেশের ১১০
ফিয়াট ডলার, স্যাংশন ও পেট্রোডলার সিস্টেম ১১২
শেষ কথা ১১৭
পরিশিষ্ট ১১৯

চিন্তা

মানুষের জীবনে অন্যতম দুঃখজনক একটি ব্যাপার হচ্ছে আরেকজন মানুষের 'দাস' হয়ে থাকা। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস জুড়ে মানুষ কখনো 'আক্ষরিক অর্থে', অর্থাৎ শারীরিকভাবে মানুষকে দাস বানিয়ে কেনাবেচা করেছে। আবার কখনো তা ঘটেছে মানসিকভাবে। কেউ হয়তো বাস্তবতার কাছে জিম্মি, কেউ হয়তো সরকারের অদৃশ্য শিকলে বন্দি।

যেভাবেই আপনি দাস হয়ে থাকুন না কেন, সেই অবস্থায় নিজের উন্নতি করার উপায় কী?

জি, দাস হয়ে উন্নতির পন্থা হলো 'মনিব' এর সহযোগী হওয়া এবং দাসত্বের সিস্টেমকে মজবুত করতে সাহায্য করা। যে যত উৎকৃষ্টভাবে দাসত্বের সিস্টেম পরিচালিত করবে এবং মনিবের কাছের মানুষ হবে তার জীবন তত সচ্ছল ও নিরাপদ হবে।

কিন্তু দাসদের সবাই কি মনিবের 'সহযোগী' হতে পারে? আসলে পারে না। কারণ মনিব সবাইকে সেই সুযোগ দেয় না। অল্প কিছু ব্যক্তিকে মনিব সুযোগ দেয় লোভনীয় পদে কাজ করতে এবং নিজের অপরাধ তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিতে।

কিন্তু, সকলে শেকল ভাঙার কাজটা করে না কেন? করে না কারণ, বিরোধিতা করে অবস্থান খারাপ করার চাইতে সিস্টেম টিকিয়ে রাখার কারিগর হয়ে উন্নত জীবনযাপন করাটা আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া আপনি যখন শেকল ভেঙে নতুন সিস্টেম তৈরি করতে যাবেন, সবাই বলবে সমাধান কী? আর যারা সিস্টেমকে মেনে নিয়েছে তারা বলবে, 'প্রতিবাদ করে মরার চাইতে তিন বেলা পেট পুরে খাওয়া উত্তম। তার চাইতেও উত্তম, কোনো চাকরি করে সচ্ছল জীবনযাপন করা। এর কোনোটা না করতে পারলে চুপ করে থাকা।'

কিন্তু এই সবকটারই উত্তরই ভুল। উত্তম হচ্ছে সবাই মিলে শেকল ভেঙে ফেলা। যেহেতু নির্যাতিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, সবাই একত্র হলে পুরো সিস্টেম নিমিষে ভেঙে পড়বে। তারপরেও সবাই একত্র হয় না কেন? হয় না কারণ, কেউ সমাধান জানে না। সমাধান না জানায় তারা মনের অজান্তে কিংবা জানতে সিস্টেমকে শক্তিশালী করার কারিগর হিসেবে কাজ করে যায় এবং মুক্তি থেকে আরো দূরে সরে যায়।

সুতরাং, শোষণ বিষয়ে জ্ঞান এবং সমাধানের রূপরেখা জানাই হচ্ছে মুক্তির প্রথম ধাপ এবং আজকে আমরা ঠিক সেই বিষয়টিই জানব।

ঋণ

খুব ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে শোষণমুক্ত অর্থনীতির রূপরেখা নির্মাণ ও ব্যাখ্যা করা যাক।

ধরুন, ছবির মতো সুন্দর একটি অঞ্চলে সবকিছু সুন্দর যাচ্ছিল, এমন সময় প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে গ্রামের চাষি কিরণ ও মজনুর খেতের ফসল নষ্ট হয়ে গেল। বিপদে পড়ে তারা খোঁজখবর নিতে থাকল কার গোলায় বাড়তি ধান আছে। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল গ্রামের মাঝখানে থাকায় উদয়ের খেতে অত্যন্ত ভালো ফলন হয়েছে। তাই তারা দুজনে মিলে গেল উদয়ের কাছে। তার কাছে গিয়ে তারা বলল, 'এই মৌসুমে আমাদের ধান নষ্ট হয়ে গেছে। পরিবার নিয়ে বেশ বিপদে আছি। তুমি আমাদেরকে কিছু ধান দাও, সামনের মৌসুমে তা পরিশোধ করে দিব।'

উদয় ছিল স্বার্থপর। সে চিন্তা করে দেখল ঋণ দিয়ে আমার লাভ কী? তার চেয়ে বরং সঞ্চয় বৃদ্ধি করলেই লাভ। বিপদের দিনে কাজে আসবে। এই ভেবে সে ঋণ দিতে রাজি হলো না।

লক্ষ করুন, এখানে কিরণ ও মজনু যা চাইল তা হচ্ছে সুদমুক্ত ঋণ। একটা সমাজকে সুন্দর রাখার জন্য ঋণের উপস্থিতি আবশ্যক। কারণ, আমাদের সবার ওপর বিপদ-আপদ আসে; তাই বিপদের দিনে ঋণ দেওয়ার চর্চা না থাকলে কোনো না কোনো সময় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবই।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখা করা যাক। ধরি গ্রামে মোট দশটি পরিবার আছে এবং তাদের প্রত্যেকের বছরে ৫০ মন ধান লাগে। সেই পরিমাণ জমিও তাদের আছে। কিন্তু প্রকৃতি যেহেতু অনিশ্চিত, স্বভাবতই বিপদ-আপদ সবার জীবনে আসবে। তাই দেখা যাবে এক বছর একজনের ফলন অনেক বেশি ভালো হয়েছে, আবার আরেকজনের ফলন হয়েছে মন্দ। এভাবে দেখা যাবে কারো গোলাতে বাড়তি সঞ্চয় থাকবে আবার কারো

গোলাতে তৈরি হয় শূন্যতা। যেহেতু সব পরিবারের চাহিদা বছরে ৫০ মন ধান, যে পরিবারের গোলাতে ৮০ মন ধান আছে তার জন্য অতিরিক্ত ৩০ মন ধানের উপযোগিতা একেবারে কম। কিন্তু যে পরিবারের গোলাতে আছে ২০ মন ধান, তার জন্য এই ৩০ মন ধান জীবনমরণ প্রশ্ন।

এবার চিন্তা করে দেখুন, বাড়তি সঞ্চয়কারী যদি অভাবীকে ঋণ দেয় কেউ কি সম্পদ হারাবে? না, ঋণ ফেরত পাবার পর প্রত্যেকের সম্পদ আগে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। কিন্তু এতে অসম্ভব রকমের উপকৃত হবে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে সমাজের মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাবে। তাই বিনা সুদে ঋণ আদানপ্রদান করলে কারো সম্পদ কমে না, বাড়েও না; বরং সমাজে বাড়তি উপযোগ তৈরি হয়। ঋণের উপস্থিতি না থাকলে সমাজ এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। বিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝতে কল্পনা করুন, একটি সমাজে কারো সাথে কারোর কোনোপ্রকারের যোগাযোগ নেই। এমতাবস্থায় একটি পরিবারের ফসলের উৎপাদন খারাপ হলে তারা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। অথচ একই সম্পদ আরেকটি পরিবারের অতিরিক্ত সঞ্চয় হিসেবে অলস পড়ে থাকবে (হয়তো ইঁদুরে খাবে)। আবার যার এই বছর ভালো ফলন হয়েছে, পরের বছরগুলোতে হয়তো তারও খারাপ ফলন হবে এবং ঋণ না পেয়ে সেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভাবতে পারছেন সম্পদের কী নিদারুণ অপব্যবহার! একটু ঋণ দিলে যেখানে পুরো সমাজ ভালো থাকতে পারত (নিজ নিজ সম্পদের পরিমাণ অক্ষুণ্ন রেখে), সেখানে এই ঋণ দেবার অনীহা সমাজের প্রত্যেককে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, ঋণের অনুপস্থিতিতে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ওপরের উদাহরণে লক্ষ করুন, বিপদগ্রস্ত পরিবার যখন কারো থেকে সাহায্য পাবে না, তখন তারা কী করবে? নীরবে বসে থেকে, না খেয়ে মরে যাবে? মোটেও না। বেঁচে থাকতে হলে তারা হয়তো চুরি-ডাকাতির পথ বেছে নিবে কিংবা মাদক ও অবৈধ ব্যবসা করবে। এভাবে ঋণের অভাবে যত পরিবার বিপদে পড়তে থাকবে তার সাথে বাড়তে থাকবে অপরাধ প্রবণতা।* এর ফলে যে সঞ্চয় করে নিরাপদে থাকতে চেয়েছিল সে নিজেও অনিরাপদ হয়ে পড়বে এবং নিজ কৃতকর্মের কারণে উপহার পাবে একটি নৈতিকতাহীন কুৎসিত সমাজ।

---

* গবেষণায় দেখা গেছে আমেরিকার যে সমস্ত রাজ্যে pay day ঋণ অনুমোদিত, সেখানে পুলিশ বিভাগগুলো অননুমোদিত রাজ্যগুলোর তুলনায় ১৪.৩৪% বেশি সম্পত্তিসংক্রান্ত অপরাধের রিপোর্ট করে। "The Impact of Pay day Lending Restrictions on Crime Rates" by DeYoung and Phillips (2009)

তৃতীয়ত, কেউ যখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ না দিয়ে ফিরিয়ে দিবে, স্বাভাবিকভাবেই বাকি সবাই শঙ্কিত ও চিন্তিত হয়ে উঠবে। নিজের বিপদের কথা চিন্তা করে সবাই যক্ষের ধনের মতন গোলা ভরতে থাকবে যা পুরো সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলবে।

চতুর্থত, আপনার বন্ধুরা যদি বিপদের দিনে আপনার পাশে না থাকে সেই বন্ধুত্ব কি আদৌ টিকবে? একইভাবে আপনার ঘরে যখন খাবার থাকবে না, তখন আপনার প্রতিবেশী যদি গুদামে খাদ্য সঞ্চয় করে তখন প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্কও টিকবে না। মানুষের মাঝে তৈরি হবে অবিশ্বাস ও ঘৃণার এক অদৃশ্য দেওয়াল। এভাবে সম্প্রীতিহীন একটি সমাজ আমরা পাব যদিও এই সম্প্রীতি তৈরি করতে কোনো অর্থ-কড়ি খরচ করার দরকার ছিল না। ছিল কেবল বিনা সুদে ঋণ দেওয়া ও ঋণ নিয়ে সঠিক সময়ে ফেরত দেওয়ার প্রবণতা।

সবমিলিয়ে 'সুদমুক্ত ঋণ আদানপ্রদান' শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সমাজে যত বেশি এর বিস্তার হবে– তত বেশি আমরা উপকৃত হব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অপরাধ প্রবণতা কমাতে পারব।

সুদ

কিরণ ও মজনু যখন ঋণের অভাবে না খেয়ে ধুঁকছিল, তখন উদয়কে তার বউ কুটিলা বলল, 'আপনার এত ধান অলস পড়ে আছে, এগুলো ফেলে না রেখে কিরণ ও মজনুকে একটু লাভে ধার দিন। আপনারও লাভ, তাদেরও লাভ।'

কুটিলার কথা শুনে উদয় ভাবল, 'আসলেই তো! একেবারে ভাতে না মেরে সুদে ঋণ দেওয়া দুই পক্ষের জন্যই বুদ্ধিমানের কাজ।'

পরদিন সে গেল কিরণ ও মজনুর কাছে। প্রস্তাব শুনে তারা দুজনই বেশ কষ্ট পেল। 'একজন আরেকজনের বিপদে এগিয়ে আসবে; এটাই তো লাভ হিসেবে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কী আর করার, যেহেতু কেউ বিনা সুদে ঋণ দিচ্ছে না, তাই তারা বাধ্য হয়ে রাজি হলো।'

ওপরের গল্পটি পড়ে মনে হতে পারে সুদ গরিব মানুষগুলোর জীবন বাঁচিয়ে দিলো। তাছাড়া গ্রামের সবাই যেহেতু স্বার্থপর, একজন আরেকজনকে এমনিতেই কিছু দিচ্ছিল না। সুদের জন্য হলেও এখন কিছু সাহায্য হলো। কিন্তু বিষয়টি কি আসলেই এমন? চলুন, বিশ্লেষণ করা যাক।

ধরুন, কিরণ ও মজনু প্রত্যেকে ৪০ সের ধান ঋণ নিল। নিয়ম হচ্ছে প্রতি মাসে এক সের ধান সুদ দিতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কী হবে? উত্তরটা নির্ভর করছে তাদের উৎপাদনের ওপর। হতেই পারে তাদের একজনের ফসলের উৎপাদন বেশি ও অপরজনের ফসলের উৎপাদন কম হবে। সেক্ষেত্রে একজন ঋণ পরিশোধ করতে পারলেও অপর জন দেউলিয়া হবে। এভাবে উদয়ের সম্পত্তি নিশ্চিত বেড়ে যাবে, কারণ তার কোনো লোকসান নেই। কিন্তু অন্যদিকে একজন নিঃস্ব ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যাবে। অর্থনীতির ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি, বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে।[১]

---

১ সুদমুক্ত ঋণে বৈষম্য বৃদ্ধি পেত না।

যদি দুইজনের ভাগ্যই খুব খারাপ হয় তবে দুজনই নিঃস্ব হবে এবং এই দুই ব্যক্তির জমি উদয়ের হাতে চলে আসবে। আর যদি দুজনের ভাগ্য খুব ভালো হয়, তাহলে তারা আগের মতোই থাকবে কিন্তু উদয় সুদের ধানে আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে। অর্থাৎ, ঘটনা যাই ঘটুক, সুদের কারণে বৈষম্য নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে।

উদয় এই ধান সঞ্চয় করে নিশ্চয়ই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না; বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে সুদে ঋণ দিবে। এভাবে প্রতি বছর তার মোট সঞ্চয় বাড়তে থাকবে এবং তার সাথে নিয়মিত কিছু কৃষক দেউলিয়া হবে, যাদের কৃষিজমি উদয়ের হাতে চলে আসবে। জমির পরিমাণ বাড়লে ধানের পরিমাণ আরো বাড়বে এবং সুদে-আসলে মোট সম্পদ ফুলে ফেঁপে উঠবে। উদয়ের দেখাদেখি একাধিক সুদের কারবারি গড়ে উঠলে কী হবে চিন্তা করতে পেরেছেন? জি, সম্পদের বণ্টন অসম হয়ে যাবে। যারা ঋণ প্রদানে বিফল হবে তারা জমি হারিয়ে অন্যের অধীনে কাজ করবে। আর যারা সম্পদ জড়ো করবে সেই সুদি ব্যক্তিরা ধনী মহাজনে পরিণত হবে।[২]

এটাতো গেল কেবল সম্পদের হিসাব। সুদের উপস্থিতি কীভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাবিত করে তা বোঝাতে বর্তমান বিশ্বের জীবনের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। লক্ষ করে দেখবেন, সুদমুক্ত উপায়ে আমাদের সমাজে যে প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মিত হয় তার মধ্যে দুটি হচ্ছে মসজিদ ও মাদ্রাসা। সেজন্য এগুলোর কাজ বছরের পর বছর একটু একটু করে আগায়। কিন্তু যদি তারাও সুদে লেনদেন শুরু করত, তাহলে কী হতো? তাহলে মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতন হয়ে যেত। কারণ, সেবার

---

২ এমন সমাজে বাহ্যিকভাবে মনে হবে বিশ্বে এত দারিদ্র্য ও ক্ষুধা কেন? ঈশ্বর কী করেন? ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ দিয়েছিলেন। সুদের চক্রে আমরা তা অসম বণ্টন করে ফেলেছি।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে ক্লাসিক্যাল বা নিও লিবারেল অর্থনৈতিক মডেলে সুদকে কোনো দিন ক্ষতিকর বলা হয়নি। বরং একেই প্রাকৃতিক বলা হয়েছে। অথচ সুদ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে। এই বৈষম্য দূর করতে বামপন্থি মডেল কর আরোপ করার কথা বলেছে। অথচ দরকার ছিল সুদমুক্ত ঋণের উপস্থিতি। এটা থাকলেই আমরা মুক্তি পেতে পারতাম। কিন্তু সুদমুক্ত ঋণের আলোচনাই অর্থনীতির বইতে অনুপস্থিত।

সত্যি কথা বলতে বর্তমানের অর্থনৈতিক মডেল টিকিয়ে রেখে সমাজকে অপরাধমুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত করা সম্ভব না। কারণ তা অন্তর্নিহিতভাবেই অপরাধী এবং দারিদ্র্য তৈরি করে। তাই যারা সুদ বিক্রি করে দারিদ্র্য দূরীকরণ করতে চায়, তারা কোনো দিন সফল হতে পারবে না। কাঠামোগতভাবেই এই সমাধান ভুল।

উদ্দেশ্যে সুদ পূরণ হয় না। আপনি কীভাবে টাকা অর্জন করলেন তা মুখ্য না সুদে। টাকা নিয়ে বাড়তি ফেরত দিতে পারলে আপনি সফল।

তাই সুদের প্রবেশ ঘটলে মসজিদগুলো হতো চাকচিক্যময়। খুব দ্রুত বড় বড় সুন্দর মসজিদ নির্মাণ হতো। কিন্তু সেখানে হক নিয়ে কোনো আলোচনা হতো না। গরিবদের টাকা দান করা, আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা করা, মেহমানদারি করা, এতিমদের খাওয়ানোর পিছে অর্থ ব্যয় না করে কেবল সব টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় আসুক এমনটাই চাইত। তখন ধনীদের তোষামোদি হতো ধর্ম। কারণ তাদের পকেটে টাকা আছে।

ইমাম-মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেওয়া হতো কে, কত ফান্ড কালেকশন করতে পারে সেই যোগ্যতা বিবেচনায়। যে ইমাম টাকা তোলাতে দক্ষ তাকে উচ্চ বেতনে নিয়োগ দেওয়া হতো (কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানের মতন)। মুসল্লিদের পকেটের দিকে মসজিদ তাকিয়ে থাকত—কীভাবে, কার থেকে, কোন উপায়ে টাকা বের করা যায়। মাদ্রাসায় তখন শেখানো হতো টাকা তোলার টেকনিক, মার্কেটিং ইত্যাদি।

কেবল মসজিদ না—চার্চ, মন্দির বা প্যাগোডায় সুদ জুড়ে দিলে একই ফলাফল হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুদ জুড়ে দিলে একই ফলাফল হবে। একইভাবে, ব্যবসাতেও সুদ জুড়ে দেওয়াতে সেটাই হচ্ছে। সুদের সাগরে ডুবে আছি দেখে অনেক সময় বুঝতে পারি না, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে যত সমস্যা দেখি তার অনেকের পিছেই প্রচ্ছন্ন কারণ হিসেবে দায়ী এই সুদ। সেজন্য শোষণ মুক্তির অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণে আমাদেরকে অবশ্যই সুদকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

দান

এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে যেকোনো সমাজ সুদমুক্ত হলে এবং একে অপরকে ঋণ দিলে শোষণ, বৈষম্য ও অপরাধ সেখানে কম থাকে। পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনগুলো মজবুত হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো অসুস্থ বাণিজ্যিক হয় না। এবার ধরা যাক, একটি সমাজে কেউ সুদে লেনদেন করে না। একে অপরকে বিনা সুদে ঋণ দেয় এবং সবাই সময়মতো ফেরত দেয়। এমন একটি সমাজকে কি আমরা আদর্শ সমাজ বলতে পারি?

না। এমন সমাজ আদর্শ নয়। কারণ এখানে অনেক বড় একটি বস্তু অনুপস্থিত। সেটা হচ্ছে দান। একটি সমাজে সবার ক্ষেত্রে ঋণ বিষয়টি কাজ করে না। যার কিছু নেই সে ঋণ নিয়ে ফেরত দিবে কীভাবে? একজন ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি কি ঋণ নিবে অথবা একজন বিকলাঙ্গ অক্ষম ব্যক্তি?

সমাজের সকল সমস্যা সমাধানে ঋণ কখনোই পর্যাপ্ত হতে পারে না। ঠিক সেই জায়গাতেই দানের স্থান। দানের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, এটা এমন কিছু অলাভজনক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যা দানের উপস্থিতি বৈ অসম্ভব। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এতিমখানা। স্বভাবতই এতিমরা ব্যবসায়ী পণ্য হতে পারে না। ঋণভিত্তিক জীবনযাপনও তারা করতে পারে না। দান ছাড়া কি এমন কোনো বস্তু আছে যা এতিমদের লালনপালন করবে, বিকলাঙ্গদের দেখভাল করবে, পাগলদের খাওয়াবে কিংবা বেওয়ারিশ লাশ দাফন করবে? আবার চিন্তা করে দেখুন, আপনার এলাকায় বনজঙ্গল বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে, নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে, এখন আপনি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চাচ্ছেন ব্যাবসায়িক স্বার্থে কি এর কোনো সমাধান আছে? সবশেষে চিন্তা করুন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন, মসজিদ) যা মানুষকে শেখাবে মিথ্যা কথা না বলতে, অন্যায় কাজ না করতে, অহংকারমুক্ত জীবনযাপন করতে, জুলুম না করতে, সুদ থেকে মুক্ত থাকতে, অভাবীদের খাওয়াতে এমন একটি প্রতিষ্ঠান

কি কোনোভাবে বাণিজ্যিক হতে পারে? ঋণভিত্তিক হতে পারে? না। একমাত্র দানই এই সকল প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে পারে। সেজন্য দানের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো দিন একটি সমাজ শোষণ মুক্ত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, দান সমাজের উপযোগ বৃদ্ধি করে। কারণ, যে ব্যক্তি দান করে তার চাইতে যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করে তার সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুন আপনার পাতে অতিরিক্ত খাবার আছে, যা নষ্ট হবে। আবার আরেকজনের পাতে পর্যাপ্ত খাবার নেই। সে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। আপনি প্রয়োজনের বেশি না খেয়ে ক্ষুধার্তকে দান করলে কল্যাণ বৃদ্ধি হচ্ছে। আবার ধরুন আপনার প্রতিদিনের খরচ ৫০০ টাকা, কিন্তু আপনার আয় দিনে ১,৬০০ টাকা। এদিকে আরেকজন অসুস্থ ব্যক্তির খরচ দিনে ২৫০ টাকা কিন্তু তার আয় দিনে ০ টাকা। আপনি যদি দিনে আড়াইশ টাকা ওনাকে দান করেন, সবমিলিয়ে সমাজে মোট শান্তির পরিমাণ বেড়ে যাবে! এর জন্য কিন্তু সমাজকে বাড়তি উৎপাদন করতে হবে না। বিদ্যমান সম্পদের দ্বারাই অনেক কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

তৃতীয়ত, দানের উপস্থিতি সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে দিবে। ওপরের উদাহরণই চিন্তা করুন, যিনি টাকার অভাবে চলতে পারছেন না, তিনি হয়তো হাত পাতবেন কিংবা পা বাড়াবেন অপরাধের নীল জগতে। আবার, ছিন্নমূল শিশুদের যদি একটি সমাজ রাস্তায় ফেলে রাখে পরবর্তীতে তারাই হবে অপরাধ, মাদক ও যৌনতার ক্রীড়নক। কিন্তু আমরা যদি এতিমদের দায়িত্ব নিই এবং তাদের লালনপালন করি, দিনশেষে আমরাই সুন্দর একটা সমাজে বসবাস করতে পারব।[৩] অর্থাৎ, অভাবীদের দান করলে অভাবী ব্যক্তি অপরাধের জগতে পা বাড়াবে না এবং তা আমাদের জীবনে কল্যাণ হয়ে ফেরত আসবে।

দানের আরেকটা বড় অর্জন হচ্ছে এটি মানুষের মাঝে সম্পর্ককে উন্নত করে। বিশেষ করে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার সম্পর্ককে। এর ফলে শ্রেণি বিপ্লব ও বিদ্বেষমূলক অপরাধ প্রবণতা কমার মাধ্যমে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ পাব। আর এভাবেই মানুষের জানমাল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে। তাই দেশের ভেতর ব্যবসা বিনিয়োগ বাড়ার পাশাপাশি বহির্বিশ্ব থেকে আসবে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ। বর্তমানে সিঙ্গাপুর, লন্ডন,

---

৩ অন্যকে সাহায্য না করলে সাময়িক প্রাপ্তি দিন শেষে নিজের জীবনে অশান্তি হয়ে ফেরত আসে। আর একটু সহযোগিতা নিজের জন্যই উপকার বয়ে আনে।

সুইজারল্যান্ডের মতো জায়গাগুলোতে বিশ্বজোড়া ধনীরা সম্পদ সঞ্চয় করে এবং কোম্পানির হেডকোয়াটার খোলে। তার কারণ এই জায়গাগুলোতে কোনো শ্রেণি বিপ্লব নেই, আন্দোলন নেই, অনিরাপত্তা নেই। এভাবে দেশগুলো এবং সেদেশের মানুষেরাও সম্পৎশালী হয়েছে। সেই তুলনায় যেই অঞ্চলে সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না সমাজ অস্থিতিশীল এবং আন্দোলন প্রবণ তা দরিদ্র অঞ্চলে পরিণত হয়। দান জিনিসটা একটি সমাজের নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। সেজন্যই দান গুরুত্বপূর্ণ।

দান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এর অনুপস্থিতির কারণে সিস্টেমের ওপর থেকে মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। আপনি যদি দেখেন দরিদ্র মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, এতিমরা বিপথে যাচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে, আপনি নিজেই সেই ব্যবস্থাকে ব্যর্থ বলবেন এবং এর থেকে মুক্তি পেতে চাইবেন। যেখানে এই সমস্যাগুলো নেই, সেই ব্যবস্থাকে উত্তম বলবেন। বিদেশে পাড়ি দিয়ে মেধা পাচার ও সম্পদ পাচারের মাধ্যমে সমাজকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। এমনকি এটা ধর্মের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। সেজন্যই ধর্ম শিক্ষা দেয় দান করতে। কারণ, যে ধর্ম সমাজের প্রচলিত সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারবে না, সেই ধর্মের ওপর মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। সেই ধর্ম থেকে মানুষ বের হতে চাইবে। আর যেই ধর্মে সমস্যাগুলোর সমাধান আছে সেই ধর্মের ওপর মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং এভাবে একটি ধর্ম বড় হবে অপর ধর্ম ছোট হবে। সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও হিসাবটা এমন।

এক কথায় দান হচ্ছে অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। অর্থনীতির গবেষণা এবং পাঠ্য বইতে যেভাবে স্বার্থকে কেন্দ্র করে সকল তত্ত্ব সাজানো হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। বলা যায় পুঁজিবাদী পাঠ্যবই এবং কাঠামোর একটি অপূর্ণতা এখানে যে সে দানকে কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবে শোষণ মুক্ত কাঠামো নির্মাণ দান ব্যতীত অসম্ভব। তাই অর্থনীতির আলোচনায় দানকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার এবং এর বিস্তৃতিতে নিরত চেষ্টা করার বিকল্প নেই।

টীকা– দানের গুরুত্ব

দান যে কত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথমে শিক্ষাঙ্গন দিয়ে শুরু করি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে

হাতে থাকা দানের সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে ৫০ বিলিয়ন বা পাঁচ হাজার কোটি ডলার। পৃথিবীর ৯৭টি দেশের জিডিপি এর থেকে কম। এই সম্পূর্ণ অর্থ ব্যক্তিবিশেষের দানের টাকায় সঞ্চিত হয়েছে। কেবল হার্ভার্ড না, বিশ্ব জুড়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয় দানের টাকাতে বৃত্তি পরিচালনা করছে। উদাহরণস্বরূপ, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দানকৃত ফান্ডের বর্তমান পরিমাণ চার হাজার কোটি ডলার, স্টানফোর্ড ৩৬০০ কোটি ডলার এবং প্রিন্সটন ৩৪০০ কোটি ডলার। পৃথিবীর ৯০টি দেশের জিডিপি প্রিন্সটনের হাতে থাকা দানের সম্পদ অপেক্ষা কম। দানের কল্যাণেই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেবল মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করানো হয়। অর্থাৎ আপনি ধনী হলে খরচ নিজে দিবেন। ধনী না হলে বিশ্ববিদ্যালয় আপনার সম্পূর্ণ খরচ দিবে। অনেকে বলবেন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই এমন। এর বাহিরে দানকেন্দ্রিক কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম চলতে পারে না। কিন্তু দেখুন বিশ্বের সবচেয়ে বড় দানের ফান্ড যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বড়। নিচে লিস্ট দেওয়া হলো :

সুইডেনের IKEA-এর প্রতিষ্ঠাতা স্টিচটিং ইংগকা ফাউন্ডেশন, নেদারল্যান্ডস, ৳ ৫৮.৫৯ বিলিয়ন।
বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, ৳ ৬০.০২ বিলিয়ন।
লিলি এন্ডাউনমেন্ট, ৳ ৪০.৮০ বিলিয়ন।
দ্য মাস্টারকার্ড ফাউন্ডেশন, কানাডা, ৳ ২৯.২৩ বিলিয়ন।
ওয়েলকাম ট্রাস্ট, যুক্তরাজ্য, ৳ ২৬.৫৪ বিলিয়ন।
হাওয়ার্ড হিউজ মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ৳ ২৪.১৭ বিলিয়ন।
নোভো নর্দিস্ক এস/এ, ডেনমার্ক, ৳ ১২.১৩ বিলিয়ন।
ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ৳ ১৬.৩৮ বিলিয়ন।
রবার্ট উড জনসন ফাউন্ডেশন, ৳ ১৩.৮৩ বিলিয়ন।
সিলিকন ভ্যালি কমিউনিটি ফাউন্ডেশন, ৳ ১৩.৮২ বিলিয়ন।

সবশেষে একজন বাংলাদেশি ব্যক্তির দানের গল্প শুনুন। ২০২৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮০০ কোটি টাকা) অনুদান দিয়েছেন রবিন খুদা। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন পাওয়া এটাই সবচেয়ে বড় তহবিল। অনুদানের এই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়টির বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ে অধ্যয়নরত পিছিয়ে পড়া নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ২০ বছর মেয়াদি এক শিক্ষা কর্মসূচিতে ব্যয় করবে।

রবিন খুদার গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে। ১৮ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান তিনি। খুদা পশ্চিম সিডনিতে বসবাস করেন এবং ২০১৭ সালে এয়ারট্রাঙ্ক নামে একটি ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠান করেন। প্রযুক্তি খাতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালে খুদা ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন নামে দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন খুদা। গত ২০২৪ সালে মার্কিন বেসরকারি ইক্যুইটি ফার্ম ব্ল্যাকস্টোনের কাছে ২৪০০ কোটি ডলারে এয়ারট্রাঙ্ক বিক্রি করে প্রতিষ্ঠানের ৩০০ জনেরও বেশি কর্মচারীকে মোট ২ কোটি ২০ লাখ ডলার বোনাস দেন তিনি, যা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়।